The Jahangirnagar Review, Part-C, Vol. XXXV, No. 2, pp 91-103
ISSN 2306-3920

দক্ষিণ এশিয়ায় তারা মূর্তির উদ্ভব, বিবর্তন ও বিস্তার

শাশ্বতী মজুমদার*

[**সার-সংক্ষেপ** : দেবী হিসেবে তারার নাম বর্তমানে বেশি শোনা না গেলেও পূর্বে দক্ষিণ এশিয়া অর্থাৎ ভারত উপমহাদেশে তারা দেবী অনেক জনপ্রিয় ছিলেন। বৌদ্ধ এবং হিন্দু উভয় ধর্মেই তারা দেবীর উপস্থিতি রয়েছে। জৈন ধর্মেও তারা দেবীর উপস্থিতি রয়েছে, তবে সেখানে তার গুরুত্ব সামান্য। মহাযান বৌদ্ধ ধর্মে দেবী তারাকে সাধারনত বুদ্ধ এবং বোধিসত্ত্ব রূপে দেখানো হয়। হিন্দু ধর্মের শাক্ত ধারায় নারী শক্তি রূপে তারার উপস্থিতি রয়েছে। অবিভক্ত ভারত এবং বাংলায় তারা দেবীর অনেক ভাস্কর্য পাওয়া যায়। এ থেকে ধারণা করা যায় এক সময়ে এ অঞ্চলে তারা দেবী অনেক জনপ্রিয় ছিলেন। তারা দেবীকে প্রধানত বিপদতাড়িনী হিসেবে পূজা করা হয়। বিশেষ করে পানিতে কেউ বিপদে পড়লে তাকে উদ্ধার করে। তিনি পানিতে থাকাকালীন অবস্থায় দিকনির্দেশনা এবং বন্যা নিয়ন্ত্রন করেন বলে জানা যায়। সংস্কৃত তারা (Tara) শব্দের অর্থ "সাঁতার কেটে পার হওয়া" (to swim across) । তিব্বত, চীন, জাপান, কোরিয়া সব জায়গাতেই তারা নামটি একই অর্থ বহন করে। বৌদ্ধ ধর্মে তারা দেবী ঠিক কবে থেকে এসেছে তা জানা যায়না, তবে ইলোরা গুহায় তার সবচেয়ে প্রাচীণ ভাস্কর্যের নিদর্শন পাওয়া গেছে বলে জানা যায়। তাঁর ভাস্কর্যগুলো ছয় শতকের পর থেকে নির্মিত হতে শুরু করেছে ধারণা করা যায়। ভারতীয় উপমহাদেশে মুসলিম শাসনের আগ পর্যন্ত বিভিন্ন জায়গায় সে অর্থে অনেক তারা ভাস্কর্য পাওয়া যায়। বর্তমানে তিব্বত, চীন, জাপান, নেপাল, ভুটান, মঙ্গোলিয়ার বৌদ্ধ ধর্মালম্বিদের মাঝে তারা দেবীর পূজা প্রচলিত রয়েছে।]

মূলশব্দ : তারা, সাধনমালা, আইকনোগ্রাফি, ভাস্কর্য, দশ মহাবিদ্যা

তারার উৎস বৌদ্ধ না হিন্দু শাস্ত্র তা নিয়ে বিতর্ক রয়েছে। গবেষক হীরানন্দ শাস্ত্রীর মতে তারা দেবীর উৎপত্তি বৌদ্ধ ধর্ম থেকে। পঞ্চম শতকের আগে দেবী হিসেবে তারার অস্তিত্ব ছিল না ধারণা করা হয় কারণ গান্ধারা (আনুমানিক প্রথম থেকে পঞ্চম শতক) শিল্পে তাকে পাওয়া যায় না। ধারণা করা হয় তারা দেবীর সবচেয়ে প্রাচীণ নিদর্শণ পাওয়া যায় বৌদ্ধ গুহা নাসিক, ইলোরা এবং কানহেরি থেকে। এই নিদর্শনগুলি পঞ্চম থেকে ষষ্ঠ শতকের দিকে এবং মহাযান বৌদ্ধ

* **শাশ্বতী মজুমদার** : সহযোগী অধ্যাপক, চারুকলা বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, **E-mail** : Shaswati.mazumder@juniv.edu

ধর্মালম্বিদের হবার সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশি। এই সময়ে তন্ত্র ধারণার বিকাশ ঘটে বৌদ্ধ এবং হিন্দু ধর্মে। এর প্রভাবে হিন্দু ধর্মের দশ মহাবিদ্যার ধারণা প্রচলিত হয়। তবে মাতৃকামূর্তির ধারণা বহু আগে থেকেই স্থানীয় অনার্য অধিবাসীদের মধ্যে প্রচলিত ছিল। তারার পূজা তাই ধারণা করা যায় কোনরূপ শাস্ত্রীয় লিখিত রূপের আগেই প্রচলিত ছিল। বজ্রযান বৌদ্ধদের লেখা সাধনমালার (এখানে তান্ত্রিক বৌদ্ধ দেবীদের পূজার নিয়ম কানুন এবং তাদের মুদ্রা সম্পর্কে ধারণা দেয়া আছে) সময়কাল আনুমানিক পঞ্চম থেকে একাদশ শতাব্দী। শাস্ত্রীর মতে তারার উদ্ভব ভারতের লাদাখের কোন এক জায়গায়, সেখান থেকে তীব্বত এবং নেপাল হয়ে তারা দেবীর পূজা ভারতে বিস্তৃত হয়। ৭ম শতকের দিকে তারা হিন্দু জনগোষ্ঠির মধ্যেও জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। তারা দেবীর পূজা এ সময় সুদূর জাভা পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। ভারতীয় উপমহাদেশে আর্যদের মধ্যে পুরুষ দেবতাদের প্রাধান্য ছিলো। শক্তির ধারণা স্থানীয়দের প্রভাবে তারা আয়ত্ব করে, এরপর বেদ এবং পুরাণে পুরুষ এবং শক্তির ধারণা আসে। এই শক্তি পরবর্তিতে স্ত্রী রূপে রূপান্তরিত হয় (Shastri: 1998)। যেমন শিবের শক্তিরূপে কালী, দুর্গা, পার্বতী অথবা অর্ধনারীশ্বর রয়েছেন আবার এরাই শিবের স্ত্রীরূপেও শাস্ত্রে অধিষ্ঠান করেন। এর প্রভাব বৌদ্ধধর্মেও পরে এবং দেবী তারাকে নারী বোধিসত্ত্বত রূপ, স্ত্রীরূপ, সকল বুদ্ধের মা এবং আরো অনেক রূপের পূজা করা হয়। প্রথম দিকে বৌদ্ধধর্মে সাধারণ নারী বোধিসত্ত্ব হিসেবে তারা দেবী উপস্থিত ছিলেন, পরবর্তিতে তিনি প্রধান দেবীদের একজন হিসেবে এককভাবে প্রতিষ্ঠিত হন। বৈদিক পুরাণ মতে দেবতাগন "শক্তির" উপর নির্ভর করতেন। ধারণা করা হয় "শক্তি" ধারণা এসেছে স্থানীয় অনার্য অধিবাসীদের কাছ থেকে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে তারা উর্বরতার প্রতীক হিসেবে মাতৃকামূর্তি পূজা করতেন। তান্ত্রিক হিন্দুধর্মে তারা দেবীকে আদিশক্তির সাথে তুলনা করা হয়। পরবর্তিতে তিনি দশ মহাবিদ্যার, দ্বিতীয় মহাবিদ্যা হিসেবে স্বীকৃতি পান।

গবেষক এম কে দাভালিকর এ বিষয়ে ভিন্ন মত পোষণ করেন। তিনি মনে করেন তারা দেবীর ধারণা এসেছে প্রাচীন বৈদিক সাহিত্য থেকে। শাস্ত্রীর মতে বৈদিক সাহিত্যে তারার নাম এসেছে দুর্গা এবং ললিতার আর একটি নাম হিসেবে। ব্রক্ষ্মান্ড পুরাণের চতুর্থ পর্বের শেষ অধ্যায়ে ললিতাপাখ্যান (Lalitopakhyana) বা ললিতা মাহাত্ম্য (Lalita Mahatmya) এ তারার নাম আলাদা ভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। এই পুরাণে তাকে মহা শক্তি এবং তারা-আম্বা (Tara-Amba) বা মা তারা হিসেবে অভিহিত করা হয়েছে। যিনি সমুদ্রগামী সকল জাহাজের রক্ষাকর্তা, অমৃত সরোবরের দিকনির্দেশনা এবং বন্যা নিয়ন্ত্রন করতে পারেন। অগ্নিপুরাণে তাকে তারা যোগিনী হিসেবে বলা হয়েছে। ড. হাজরার মতে ব্রক্ষ্মান্ড পুরাণ সবচেয়ে প্রাচীণ গ্রন্থাবলীর মধ্যে পরে এবং এর সময়কাল পঞ্চম শতকের আগে। সেক্ষেত্রে তারার ধারণা বৈদিক সাহিত্যে তান্ত্রিক হিন্দু সাহিত্যের আগেই এসেছে। বৌদ্ধ সাহিত্যে সাধনমালায় (সম্ভবত পঞ্চম থেকে এগারো শতকের মধ্যে রচিত) তারার উল্লেখ এর পরে ষষ্ঠ শতকে পাওয়া যায়। বৌদ্ধ ধর্মে হিন্দু দেবদেবীর আত্মীকরণের অনেক উদাহরণ রয়েছে। যেমন স্বরস্বতী, কুবের ইত্যাদি। ষষ্ঠ শতকে বৌদ্ধ গুহা নাসিক, ইলোরা, কানহেরি, আওরঙ্গবাদ এবং অজন্তায় তারার ভাস্কর্য পাওয়া যায়। সমুদ্রতীরবর্তী জায়গা বলে স্বাভাবিক ভাবেই এখানে তারার পূজা মহাযান বৌদ্ধধর্মে খুব জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। এম কে দেভালিকরের মতে তারার উৎপত্তি সম্ভবত এখানেই, লাদাখে নয় (Dhavalikar : 1963-64, Vol. 24)।

এম কে দাভালিকরের এই বক্তব্যের প্রধান অনুষঙ্গ ব্রক্ষ্মান্ডপুরাণ। এর সময়কাল নিয়ে মতবিরোধ রয়েছে। সাম্প্রতিক তথ্য অনুযায়ী এর সময়কাল চতুর্থ থেকে ষষ্ঠ শতকের মধ্যে। কিন্তু এই পুরাণে সময়ের সাথে সাথে বিশেষ করে দশম শতকের পর থেকে বার বার পুনর্বিন্যাস করা হয়েছে। পুরানো লেখার উপরে আবার নতুন লেখা হয়েছে। তাই প্রাচীণ ব্রক্ষান্ডপুরাণে আসলে কার নাম কিভাবে উল্লেখ ছিল তা এখন আর সঠিক ভাবে বোঝার উপায় নেই। তারার নাম আগে থেকেই ব্রক্ষান্ডপুরাণে ছিল, সেখান থেকে তান্ত্রিক হিন্দুধর্মে এবং মহাযান বৌদ্ধধর্মে তারা প্রবেশ করে একথা নির্দিষ্ট করে বলার কোনো সুযোগ নেই। অপর দিকে বৌদ্ধ এবং তান্ত্রিক হিন্দু ধর্মে তারার জনপ্রিয়তা লক্ষ্য করে পরবর্তিতে ব্রক্ষান্ডপুরাণে তারাকে আলাদা দেবী হিসেবে অন্তর্ভূক্ত করা হয় এমনো হতে পারে। বৌদ্ধগুহায় (নাসিক, কানহেরি, ইলোরা) তারার ভাস্কর্যের উপস্থিতে একথা নিশ্চিত করে বলা যায় ষষ্ঠ শতকের দিকে মহাযান বৌদ্ধধর্মে তারা সুপ্রতিষ্ঠিত ছিলেন এবং পরবর্তিতে তান্ত্রিক হিন্দু ধর্ম এবং জৈন ধর্মে তারা দেবী বিস্তার লাভ করে।

মহাযান এবং বজ্রযান বৌদ্ধধর্মে তারা দেবীর অনেক রূপের পূজা করা হয়। অষ্টম শতকে পাল পৃষ্ঠপোষকতায় পাল সাম্রাজ্যে তারা দেবীর পূজা বিস্তৃত হয়। তন্ত্রের প্রভাবে বজ্রযান দেবী হিসেবে তারা পাল সাম্রাজ্যে বিস্তার করে। অপরদিকে ভারতীয় বৌদ্ধধর্মের প্রচার আন্দোলনের বৌদ্ধ ধর্মগুরু পদ্মসম্ভব (Padmasambhaba) তিব্বতের বৌদ্ধসমাজেও বজ্রযান তারা দেবীর পূজা প্রচলনে ব্যাপক ভূমিকা রাখেন। পরবর্তিতে তারা তিব্বত, মঙ্গোলিয়া, নেপাল, ভূটানে, সিকিমে ব্যাপক জনপ্রিয়তা অর্জন করে।

মহাযান বৌদ্ধধর্মে তারা দেবীর উৎপত্তি সম্পর্কে অনেক মতবাদ রয়েছে। বৌদ্ধধর্মে যিনি ত্রাণ বা উদ্ধার করেন তিনিই তারা। এখানে প্রাচীণ পুরাণে তারা দেবী পানিতে দিকনির্দেশনা বা বন্যা নিয়ন্ত্রন করেন বলে জানা যায়, তা ধীরে ধীরে পরবর্তিত হয়। বৌদ্ধধর্মের মূলে রয়েছে Compassion বা দয়া অথবা সহানুভূতি। তার জন্মের সবচেয়ে জনপ্রিয় গল্প হচ্ছে তারার জন্ম অবলোকিতেশ্বরের সহানুভূতি থেকে। অবলোকিতেশ্বর একসময় জগতের সকল জীবের সীমাহীন দুঃখ দূর্দশায় ব্যাকুল হলে তার চোখ থেকে অশ্রু পড়তে থাকে। এই চোখের জল একটি সরোবরে জমা হলে সেখানে একটি পদ্মফুল ফোটে। এই পদ্মফুল থেকে অপূর্ব সুন্দর তারার জন্ম হয়, যিনি সহস্র পদ্মফুলের থেকেও সুন্দর। তিনি অবলিকিতেশ্বরকে স্বান্তনা দেন এবং আশ্বাস দেন অবলিকিতেশ্বরের সাথে তিনিও জগতের সকল জীবের দূর্দশা নিবারণে তার পাশে থাকবেন। তিব্বতে এই কিংবদন্তী বিকশিত হবার পরের ধাপে অবলিকিতেশ্বরের চোখ থেকে দুই ফোটা অশ্রু বের হয়। যার বাম পাশের অশ্রু থেকে সবুজ তারা এবং ডান পাশের অশ্রু ফোটা থেকে সাদা তারার জন্ম হয়।

তিব্বতের লামা তারানাথের গল্পে তারা ছিলেন মানুষ, একজন রাজকন্যা যাকে জ্ঞানের আধার (Moon of knowledge) বলা হত। তিনি ছিলেন বুদ্ধের একনিষ্ঠ ভক্ত। তিনি চরম জ্ঞান (Enlightenment) লাভের জন্য অনেক বছর কঠোর তপস্যা করেন। বহু বছর হয়ে গেলেও তার সাধনায় সিদ্ধি না হওয়ায় কিছু বৌদ্ধ সন্ন্যাসী তাকে পুরুষ হয়ে সাধনা করতে বলেন, যাতে তিনি দ্রুত ফল লাভ করতে পারেন। রাজকন্যা তা করতে অস্বীকৃতি জানায় এবং অবশেষে নারী শরীরে তিনি সিদ্ধি লাভ করেন। তিনি সকল জীবের ত্রাতা হিসেবে জ্ঞান লাভ

করেন এবং তারা নামে পরিচিত হন। তিনি সকল খারাপ শক্তিকে পরাজিত করে জগতের সমস্ত প্রাণীকে বিপদের থেকে রক্ষা করেন। পরবর্তিতে বহুযুগ পরে তিনি বুদ্ধত্ব লাভ করেন এবং সকল বুদ্ধের মা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হন (Shaw: 2006)।

এভাবে তারার জন্মের বহু গল্প বা কাহিনী রয়েছে, অঞ্চলভেদে তারার চরিত্রের ভিন্নতা রয়েছে। কখনো তিনি নারী বুদ্ধ রূপে, বুদ্ধের শক্তি হিসেবে, কখনো জগতের ত্রাণ কর্তা রূপে, কখনো জগতের সকল জ্ঞান এবং সহানুভূতির দেবী দিসেবে, আবার বিশ্বজগতের সকল জীবের জননীরূপে প্রতিষ্ঠিত রয়েছেন। প্রথম দিকে তারা বুদ্ধের শক্তি হিসেবে আসে, পরবর্তিতে তারার জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পায় এবং বৌদ্ধ ধর্মে প্রধান দেবীদের মধ্যে অন্যতম হয়ে ওঠেন।

প্রায় চারশো(অষ্টম থেকে বারো শতক) বছর বাংলায় পাল রাজারা শাসনকরে। এ সময় স্থাপত্য এবং শিল্পকলায় অনেক উন্নতি হয়। সোমপুর মহাবিহার, বিক্রমশীলা মঠ, ওদান্তপুরি মঠ এবং আরও অনেক ধর্মীয় স্থাপনা তৈরি হয় পাল পৃষ্ঠপোষোকতায়। পাল রাজারা ছিলেন মহাযান বৌদ্ধধর্ম্বালম্বি। তাদের প্রজারা ছিল অধিকাংশ হিন্দু। তারা অন্য ধর্মের প্রতিও সহনশীল ছিলেন। ফলে প্রচুর পরিমানে হিন্দু এবং বৌদ্ধ ধর্মের সাহিত্য, ছবি, ভাস্কর্য এবং অন্যান্য শিল্পকলার নিদর্শন পাওয়া যায়। বজ্রযান বৌদ্ধধর্ম প্রচারে তারা অনেক মনোযোগী ছিলেন। তিব্বতের বৌদ্ধধর্মে তান্ত্রিক মতবাদের প্রচলন পাল পৃষ্ঠপোষকতায় হয়। তিব্বতের বৌদ্ধ লামা তারানাথের বইতে উল্লেখ করেন এ সময়ে পাল শিল্পকলার উন্নতির জন্য ধীমান এবং বীতপাল নামে দুজন শিল্পীকে নিয়ে আসা হয় যারা ভাস্কর্য নির্মানের জন্য ধাতু ঢালাই, তক্ষণ, এবং চিত্রকলার জন্য বরেন্দ্র অঞ্চলে সুবিখ্যাত ছিলেন। পাল রাজাদের সময় বাংলায় তান্ত্রিক বৌদ্ধ ও হিন্দু ধর্মের সবচেয়ে বেশি চর্চা হয়। উভয় ধর্মেই তারা দেবী রয়েছেন। এই সময়ে বাংলায় সবচেয়ে বেশি তারা দেবী ভাস্কর্য পাওয়া যায়। বজ্রযান বৌদ্ধধর্মে তারা দেবীর অনেক রূপের উপস্থিতি আছে। ভাস্কর্য নির্মানের ক্ষেত্রে শিল্পীরা নির্দিষ্ট কিছু আইকোণিক বৈশিষ্ট মেনে কাজ করেন। বাংলায় বজ্রযান তারা দেবী এত ধারা উপধারায় বিভক্ত এবং ভাস্কর্য্যের গড়নেও রয়েছে অনেক বিভিন্নতা। তাই এর সবগুলি রূপ এখনো নিরুপন করা সম্ভব হয় নি। ১৯২৫ সালে গবেষক বিনয়তোষ ভট্টাচার্য(১৮৯৭-১৯৬৪) বৌদ্ধ ধর্মের বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন লেখকের লেখা “সাধনা”(Shadhana) এবং তান্ত্রিক আচার নিয়ে রচিত পান্ডুলিপিসমূহ একত্রিত করে সাধনমালা (Sadhanamala) বই সম্পাদনা করেন। এই সাধনাসমূহে সমস্ত বৌদ্ধ দেবদেবীর পূজার আচার এবং তাদের প্রত্যেকের মুদ্রার রূপ বর্ননা করা হয়েছে। সাধনমালার উপর ভিত্তি করে বিনয়তোষ ভট্টাচার্য তারার চব্বিশ রূপের মূর্তিতাত্ত্বিক বা Iconography বর্ণনা দিয়েছেন তার “The Indian Buddhist iconography : Based on the Sadhanamala and cognate Tantric texts of rituals” বইতে।

নলিনীকান্ত ভট্টশালী (১৮৮৮-১৯৪৭) তার “Iconography of Buddhist and Brahmanical Sculpture in the Dacca Museum” বইতে ধ্যানী বুদ্ধের সাথে সম্পর্কের ভিত্তিতে তারার অনেক ভাগ করেছেন। নলিনীকান্ত বাংলা অঞ্চলে প্রাপ্ত ভাস্কর্যগুলোর আলোকে তারার শ্রেনীবিভাগ করার চেষ্টা করেছেন। আদি বুদ্ধ এবং আদি প্রজ্ঞা বা প্রজ্ঞা পারমিতা হল বিশ্বজগতের পিতা এবং মাতা। প্রজ্ঞা পারমিতার আরেকটি রূপ হল তারা। পাঁচজন ধ্যানী বুদ্ধ

রয়েছেন, এরা হলেন Vairochana, Aksobhya, Ratnasambhava, Amitava এবং Amoghasidddhi।

সাধনমালায় তারা বুদ্ধের শক্তি হিসেবে আছে, তাদেরকে রং দিয়ে আলাদা করা হয়েছে। পাঁচজন ধ্যানী বুদ্ধের শক্তি হিসেবে তারা কাজ করে। আবার প্রত্যেক রংয়ের তারার আলাদা অনেক নাম রয়েছে।

1. Vairocana (বৈরচনা) - White Tara (শুভ্র তারা) – Janguli Tara (জাংগুলী তারা), Marichi (মারিচী), Usnisavijaya (উষ্ণীসভীজয়া)
2. Aksobhya (অক্ষোভ্য) - Blue Tara (নীল তারা) - Nila Tara or Ekajata (একজটা)
3. Ratna Samvaba (রত্নসম্ভব) - Yellow Tara (হলুদ তারা) – Vasudhara (বসুধরা), Vajra Tara (বজ্র তারা)
4. Amitava (অমিতাভ) - Red Tara (রক্ত তারা) - Rakta Tara or Kurukulla (কুরুকুল্লা), Sitatapatra (সীতপত্র), Bhrukuti (ভ্রুকুটি)
5. Amoghasiddhi (অমোঘ সিদ্ধি)- Green Tara (সবুজ তারা) – Parnasavari (পর্নোসবরী), Syama Tara (শ্যামা তারা)

ভাস্কর্যের ক্ষেত্রে রং দিয়ে আলাদা করে তারা ভাস্কর্য চেনা সম্ভব হয় না, এক্ষেত্রে মুদ্রা দেখে চিনতে হয়। বাংলা অঞ্চলে পাওয়া তারা ভাস্কর্যসমূহ প্রধানত পাল যুগের। এসময় তন্ত্রের প্রভাবে তারা ভাস্কর্যের রূপের অনেক পরিবর্তন হয়। সাধনমালায় উল্লেখকৃত নিয়ম অনুযায়ী এখানকার তারা ভাস্কর্যসমূহের ক্ষেত্রে সবসময় প্রয়োগ করা হয়নি। তিব্বতের তারা ভাস্কর্যের নির্মানে সাধনমালার উল্লেখিত মূর্তিতাত্ত্বিক নিয়মগুলি সুনির্দিষ্ট ভাবে নিয়ম মেনে করা হয়। তাই অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় (নাম অনুযায়ী) একই তারা ভাস্কর্য হলেও তাদের নির্মানে ভিন্নতা রয়েছে। বিনয়তোষ ভট্টাচার্যের (The Indian Buddhist iconography: Based on the Sadhanamala and cognate Tantric texts of rituals) তারার আইকনোগ্রাফির সাথেও পাল বাংলা অঞ্চলে পাওয়া তারার আইকণোগ্রাফীতে অনেক অমিল রয়েছে। ধারণা করা যায় ভারতের অন্যান্য অংশে তারার যে রূপ পাওয়া যায় তা পাল বাংলা অঞ্চলে তন্ত্র এবং হিন্দুধর্মের প্রভাবে অন্য রূপ ধারণ করে। পাল বাংলা অঞ্চলে পাওয়া কিছু তারা ভাস্কর্য নিয়ে আলোচনা করা হলো-

সবুজ তারা বা শ্যামা তারা

তারা দেবীর বহু রূপের মধ্যে সবুজ তারা সবচেয়ে জনপ্রিয়। সংস্কৃত ভাষায় তাকে শ্যামা তারা বলা হয়। তাঁর সবুজ রং, জ্ঞান, মুক্তি, কর্মফল এর প্রতিকী হিসেবে আছে। প্রকৃতি, গাছপালা, প্রানীর সাথে তার সম্পর্ক রয়েছে। দাঁড়ানো এবং বসা দুভাবেই তাকে দেখা যায়। তার আইকনোগ্রাফিতে দেখা যায় তার চারপাশে পদ্মফুলের বন, কখনোবা জঙ্গলের ভিতরে সিংহের পিঠে জন্তু জানোয়ার পরিবেষ্টিত হয়ে আছেন। তাঁর এই রূপ প্রাচীণ লোককথার বন দেবী, বা জঙ্গলের দেবীর কথা মনে করিয়ে দেয়।

ঢাকার মুন্সিগঞ্জের সুখাবাসপুরে শ্যামা তারার একটি প্রাচীন ভাস্কর্য পাওয়া গেছে। তারা দেবী এখানে ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিতে দাঁড়ানো, তাঁর বাম হাত বরদা মুদ্রায় একটি অর্ধফোটা (উতপলা) পদ্মফুল ধরে আছেন। ভাস্কর্যটি চুনাপাথরে তৈরি উচ্চতায় প্রায় চার ফুট। অনেক জায়গায় ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে। এর সময়কাল নিয়ে মতভেদ আছে। নলিনীকান্ত ভট্টশালির মতে ভাস্কর্যটি পাল আমলের প্রথম দিকের বা তার আগের হতে পারে। এ কে এম শামসুল আলমের মতে ভাস্কর্যটি অনেক আগের হলেও নবম শতকের আগে নয় (Alam : 1985)। এখানে তারা দেবী একক ভাবে আছেন, সাধারণত সবুজ তারা দেবীর সাথে একজটা এবং অশোকান্তা মারিচী থাকে।

শ্যামা তারা, সুখাবাসপুর

শ্যামা তারা, সোমপুর

সূত্র : বই- বুদ্ধিস্ট এন্ড ব্রাহ্মানিকাল স্কাল্পচার; নলীনিকান্ত ভট্টশালী, পৃষ্ঠা ৫৬,৫৭

নওগাঁ জেলার সোমপুর বিহারে পাওয়া শ্যামা তারা ভাস্কর্য কালো পাথরে তৈরি। তিনি পদ্মফুলের উপরে বসে আছেন। তার ডান পা আরেকটি পদ্মফুলের উপরে রাখা। ডান হাত বরোদা মুদ্রায়, বাম হাতে অর্ধফোটা নীল পদ্ম ধরে আছেন। তার পদ্ম সিংহাসনের নীচের বাম দিকে বজ্রস্বত্ত্ব জোড়াসনে বসে আছেন, তার ডান হাতে বজ্র এবং বাম হাতে ঘন্টা (Bell)। নীচের ডান দিকে দেবী অশোকান্তা (মারীচি) বসে আছেন, তার বাম হাতে আশোক পাতা এবং ডান হাতে অভয় মুদ্রায় আছে। অশোকান্তা সর্বডানে দেবী একজটা আছেন তার ডান হাতে একটি ছুরি এবং বাম হাতে মাথার খুলির বাটি ধরে আছেন। দেবীর দুই পাশে একের উপরে আরেকটি করে আট তারার ছোট অনেক ফিগার আছে। প্রত্যেকের বাম হাতে পদ্মফুল এবং ডান হাত অভয় মুদ্রায় বুকের মাঝে আছে। প্রত্যেক দেবীর সাথে সঙ্গী রয়েছে, মোট দশজনের মত। এদের একজন নারী এবং বাকি সকলে পুরুষ। প্রথম দুইপাশের দুইজন তারার সাথে সিংহ এবং হাতি বাহন হিসেবে রয়েছে। একদম উপরে একটি কীর্তিমুখা লক্ষ্য করা যায়।

খাদিরাবানি তারা

শ্যামা তারা বা সবুজ তারার আরেক নাম খাদিরাবানি তারা। বাংলায় খাদিরাবানি তারার অনেক ভাস্কর্য পাওয়া যায় বরেন্দ্র অঞ্চলে। রাজশাহীর বরেন্দ্র গবেষণা জাদুঘরে খাদিরাবানি তারার অনেক ভাস্কর্য রয়েছে। এগুলো বেশির ভাগ দশম থেকে বারো শতকের ধারণা করা হয়। খাদিরাবানি তারা দাঁড়ানো এবং বসা অবস্থায় থাকে, ডান হাত বরোদা মুদ্রায় এবং বাম হাতে পদ্মফুল থাকে। সাধারনত তার সাথে অশোকান্তা বা মারীচি এবং একজটা থাকে।

খাদিরাবানি তারা, বগুড়া, **সূত্র :** ভি. আর. এম. ক্যাটালগ

বগুড়ার শিবগঞ্জে একটি কালো ব্যাসাল্টের খাদিরাবানি তারা পাওয়া যায়। ধারণা করা হয় ভাস্কর্যটি ১০ম শতকের। তারা দেবী এখানে ত্রিভঙ্গ মুদ্রায় দাড়িয়ে আছেন। তার হাত দুটি ভেঙ্গে গেলেও বোঝা যায়, এক হাত বরোদা মুদ্রায় অপর হাতে পদ্মফুল ধরে আছেন। তার দুই পাশে একজটা এবং অশোকান্তা মারীচি। তাদের প্রত্যেকের চার হাত এবং ত্রিভঙ্গ মুদ্রায় দাড়িয়ে আছেন। তারা দেবীর পরনে শাড়ি এবং উত্তরীয় এবং বিবিধ অলংকারে বিভূষিত। তার মুখে শান্ত সমাহিত ভাব। নাক ক্ষতিগ্রস্ত হলেও মুখের ভাব বোঝা যাচ্ছে। পিছনের পাথরের স্ল্যাবে একজটা এবং অশোকান্তার উপরে হাতি এবং সিংহ। দেবীর মাথার পিছনে প্রভামন্ডল। তার দুপাশে ত্রিকোনাকার ফুলের নকশা, তার পরে স্তুপা। একদম উপরে দুই পাশে দুজন বিদ্যাধরা (Vidyadharas) মেঘের মধ্যে ফুলের মালা হাতে আছেন।

এখানে সাধনমালার লিখনিতে খাদিরাবানি তারার যে বর্ননা আছে তার কিছু পরিবর্তন দেখতে পাই। একজটা এবং অশোকান্তার দুই হাতের বদলে এখানে দেখা যায় চার হাত।

অশোকান্তার সরু ফিগারের পরিবর্তে বলিষ্ঠ এবং মোটা পেট দেখানো হয়েছে যা একদমই বিপরীত।

বজ্র তারা

বজ্র তারার কিছু স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট রয়েছে। তাঁর চার মুখমন্ডল, আঁট হাত রয়েছে। প্রত্যেক মুখে তিনটি চোখ আছে। মুখের রং যথাক্রমে হলুদ, কালো, সাদা এবং লাল। তিনি জোড়াসনে পূর্ণ বিকশিত পদ্মের উপর বসে থাকেন, পদ্মের চারপাশে গোল হয়ে তার আটজন সঙ্গী থাকে। তার ডান হাতগুলোতে থাকে বজ্রদন্ড (Thunder-bolt), তীর, শঙ্খ এবং বরোদ মুদ্রা। বাম চার হাতে থাকে নীল পদ্ম, ধনুক, হাতির অঙ্কুশ (Elephant-goad) এবং তর্জনি মুদ্রা।

বজ্র তারার যে ভাস্কর্য পাওয়া যায় তাতে হাতের অনুষঙ্গে কিছু পার্থক্য দেখা যায়। সাধারণত ব্রোঞ্জে আট পাপড়িযুক্ত পদ্ম তৈরি করা হত যার মাঝে বজ্র তারা আসীন থাকতেন, আট পাপড়িতে আটজন সঙ্গী থাকতো। এমন ভাবে এই ভাস্কর্যের নকশা তৈরি করা হত যাতে পাপড়িগুলো বন্ধ করে একটি পদ্ম কলির মত হয়ে যায়। আবার খুলে দিলে পদ্মের মাঝে বজ্র তারাকে দেখা যায়। তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্মের কোন পূজা বা আচারের জন্য এমনভাবে বানানো হয় ধারণা করা হয়। তিব্বতের বজ্রযান বৌদ্ধদের মান্দালাতে এর প্রভাব দেখা যায়।

পদ্মফুলের ভিতরে বজ্রতারা, পাথর ঘাটা, **সূত্র :** বই- বুদ্ধিস্ট এন্ড ব্রাহ্মানিকাল স্কাল্পচার; নলীনিকান্ত ভট্টশালী, পৃষ্ঠা ৪৭

পাথরঘাটার একটি মন্দির থেকে চমৎকার একটি বজ্র তারাদেবীর মূর্তি পাওয়া যায়। প্রায় আঁট ইঞ্চি লম্বা, এই ভাস্কর্যটি দশম থেকে এগার শতকের ধারণা করা হয়। বর্তমানে কলকাতা যাদুঘরে আছে। বজ্রতারা জোড়াসনে পদ্মের মাঝখানে বসে আছেন সামান্য ডান দিকে হেলে আছেন। তার চারপাশে আটজন নারী একজন বসে একজন দাঁড়িয়ে এভাবে গোল হয়ে হয়ে আটটি পাপড়িতে দন্ডমান বা বসে আছেন। বসা নারী ফিগারগুলি তারা এবং দাঁড়ানো ফিগারগুলি

যোগীণি। তাদের আইকনিক বৈশিষ্ট দেখে নলিনীকান্ত ভট্টশালী এই তারা এবং যোগীণিদের নাম চিনহিত করেছেন। তাদের নাম যথাক্রমে

1. Gandha tara,
2. Vajraghanta,
3. Dipa Tara,
4. Vajrapasi,
5. Dhupa Tara
6. Vajrasphoti
7. Puspa Tara,
8. Vajrankusi

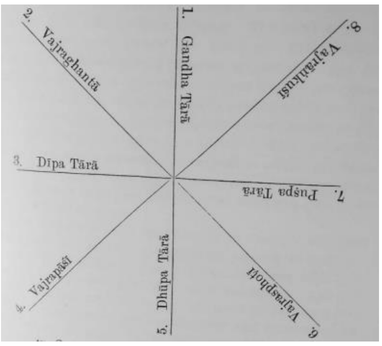

তারা এবং যোগিনীদের ক্রমানুযায়ী অবস্থান

পদ্মফুলের ছয় এবং আঁট নম্বর পাপড়িতে যোগিনী

সূত্র : বই- বুদ্ধিস্ট এন্ড ব্রাক্ষানিকাল স্কাল্পচার; নলীনিকান্ত ভট্টশালী, পৃষ্ঠা ৫০

বাংলাদেশের ফরিদপুরে একটি এ ধরনের বজ্রতারা দেবী ভাস্কর্য পাওয়া গেছে, এর বেশির ভাগ অংশই ভেঙ্গে গেছে। মাঝখানের বজ্রতারার অংশটি পাওয়া যায়নি। আট পাপড়ির তিনটি পাপড়ি ভেঙ্গে গেছে। বাকি পাপড়িগুলোর ভিতরের নারীমূর্তিগুলো অক্ষত আছে। বর্তমানে এই ভাস্কর্যটি ঢাকা যাদুঘরে আছে।

বজ্রতারা, ফরিদপুর, **সূত্র** : বই- বুদ্ধিস্ট এন্ড ব্রাক্ষানিকাল স্কাল্পচার; নলীনিকান্ত ভট্টশালী, পৃষ্ঠা ৪৯

হিন্দু শাস্ত্রে দেবী দূর্গার একটি রূপ হিসেবে তারাকে চিহ্নিত হয়। বৈদিক পুরাণ মতে দেবতারা "শক্তির" উপর নির্ভর করতেন। ধারণা করা হয় "শক্তি" ধারণা এসেছে স্থানীয় অনার্য অধিবাসীদের উর্বরতার বিশ্বাসের কারণে মাতৃকামূর্তি পূজার ধারণা থেকে। তান্ত্রিক হিন্দুধর্মে তারা দেবীকে আদিশক্তির সাথে তুলনা করা হয়। প্রধানত শিবের শক্তি হিসেবে তারাকে চিনহিত করা হয়। পরবর্তিতে তিনি দশ মহাবিদ্যার, দ্বিতীয় মহাবিদ্যা হিসেবে স্বীকৃতি পান।

সৃষ্টির শুরুতে সর্বোচ্চ দেবতা বিষ্ণু অনন্ত নিদ্রায় পানিতে শায়িত ছিলেন। তার নাভীমূল থেকে বের হয়ে আসা পদ্মের উপর স্রষ্টা ব্রক্ষ্মা ধ্যান করছিলেন। এমন সময় বিষ্ণুর কান থেকে মধু এবং কৈটভ নামে দুই অসুর বের হয়ে আসে এবং ব্রক্ষ্মা এবং তার সৃষ্টিকে ধ্বংস করতে উদ্যত হয়। ব্রক্ষ্মা তখন সার্বজনীন মাকে আহবান করে, তিনি এসে বিষ্ণুকে মায়া নিদ্রা থেকে জাগান এবং বিশ্বজগৎকে ধ্বংস হতে রক্ষা করেন।

পরবর্তিতে মার্কেন্ডপুরাণের দেবী মাহাত্ম্যে দেবী দুর্গাকে মহিষাসুর বধ করতে দেখা যায়। এখানে সকল দেবতার শক্তি একত্রিত করে দেবী শক্তিকে জাগ্রত করা হয়। তার বাহন হিসেবে সিংহ প্রথম এখানে দেখা যায়।

পরবর্তিতে শিবের সাথে শক্তির সরাসরি যোগাযোগ পাওয়া যায়। একদা শুম্ভ ও নিশুম্ভ নামে দুই অসুর প্রচন্ড শক্তিশালী হলে দেবতাদের উপর নির্যাতন শুরু করে। দেবতারা তখন পরিত্রাণের জন্য প্রার্থনা শুরু করে। এই সময় শিবের স্ত্রী পার্বতী সেখান দিয়ে যাচ্ছিলেন, তিনি দেবতাদের কাছে জানতে চান কার উদ্দেশ্যে দেবতারা প্রার্থনা করছেন। তখন পার্বতীর শরীরের অংশ হতে শিব (শিবের নারী অংশ বা অর্ধনারীশ্বর) উদ্ভূত হয়ে পার্বতীকে উত্তর দেন "এই দেবতারা আমার কাছে প্রার্থনা করছে"। পার্বতীর শরীর থেকে উদ্ভূত বলে তার শিবের আরেক নাম হয় কৌশিকী (Vattashali: 1929)

যখনই দেবতারা কোন বিপদের সম্মুখিন হয়েছেন প্রতিবারই নারী শক্তির উদ্ভব হয়েছে এবং তিনি বিভিন্ন রূপ ধারণ করে দেবতাদের বিপদ হতে রক্ষা করেছেন। তান্ত্রিক হিন্দু ধর্মে তারা দেবী হল আদিশক্তি পার্বতীর আরেক রূপ। এ মতবাদে দশ মহাবিদ্যা রয়েছেন। এরা হলেন কালী, তারা, ত্রিপুরা সুন্দরি, ভুবনেশ্বরী, ভৈরবী, ছিন্নমস্তা, ধুমাবতী, বগলামুখী, মাতঙ্গী এবং কমলা। একারনে তারা দেবীকে দ্বিতীয় মহাবিদ্যা বলা হয়। তারা দেবীর প্রধান তিনটি রূপ হল একজটা, উগ্রতারা এবং নীলাসরস্বতী। বৌদ্ধ এবং হিন্দু উভয় ধর্মেই উগ্রতারা রয়েছেন। তার রূপ প্রধানত ভয়ানক এবং যুদ্ধভাব থাকে।

উগ্রতারা

তারা তন্ত্র বইতে উগ্রতারার বর্নণা দেওয়া হয়েছে। উগ্রতারা সাদা পদ্মফুলের উপরে দাঁড়ানো থাকেন। তার চার হাতে ছুরি, তলোয়ার, নীল পদ্ম এবং মাথার খুলি থাকে। তার রক্তের মত লাল তিন চোখ থাকে। তার শরীর নীল রঙের সাপ দ্বারা অলংকৃত থাকে। তার চুলে একটি বেনী করা থাকে, তার জিভ এবং দাঁত বের করা থাকে। তার কোমরে হাতির চামড়া দ্বারা আবৃত থাকে। তার গলায় থাকে মাথার খুলির মালা। তার পায়ের নীচে মানুষের মৃতদেহ এবং দুটি পদ্ম থাকে। তার মাথার উপরে থাকে শিবের প্রতিচ্ছবি।

বাকেরগঞ্জের শিকারপুরে উগ্রতারা একটি ভাস্কর্য পাওয়া যায়। হিন্দুধর্মে শক্তিপুজার একান্ন পীঠ স্থানের একটির মধ্যে শিকারপুর রয়েছে। শিকারপুরের উগ্রতারার রূপ বইতে যে বর্নণা

আছে তার সাথে কিছু অমিল রয়েছে। এই ভাস্কর্যে তারার মাথার উপরে পাঁচজনের মুখ আছে। সবার উপরে শিব তার দুই পাশে ডানে কার্তিক, গনেশ বামে ব্রহ্মা এবং সম্ভবত বিষ্ণু। ভাস্কর্যের পাদদেশে ছয়জন পূজারী আছে, নারী এবং পুরুষ। তারার দুই পাশে দুইজন সেবক আছে।

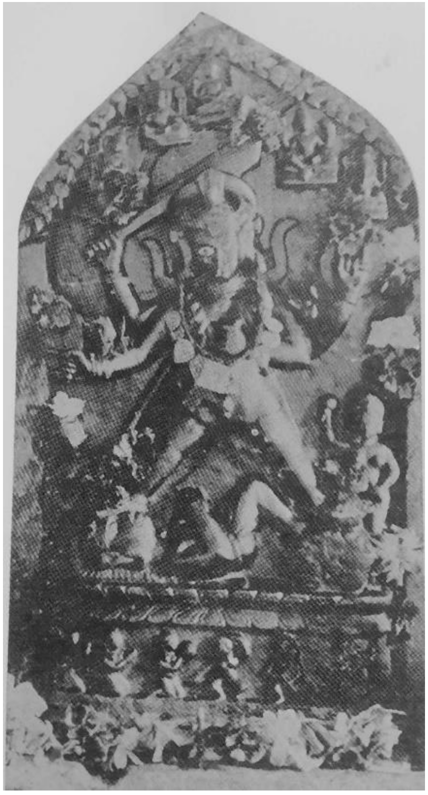

উগ্রতারা, শিকারপুর, **সূত্র** : বই- বুদ্ধিস্ট এন্ড ব্রাহ্মানিকাল স্কাল্পচার; নলীনিকান্ত ভট্টশালী, পৃষ্ঠা ২০৬

উগ্রতারার পিছনে সাধারণত শুধু শিবের মুখ থাকার কথা থাকলেও এখানে পাঁচজনকে দেখা যাচ্ছে। বৌদ্ধ ভাস্কর্যের পাঁচ ধ্যানী বুদ্ধের সাথে এর মিল রয়েছে। উগ্রতারার ধারণা হিন্দুধর্মে প্রধানত বৌদ্ধধর্ম থেকে এসেছে। ভাস্কর্য তৈরিতেও তাই বৌদ্ধ ভাস্কর্যের প্রভাব পরেছে।

তারা দেবীর অনেক রূপ রয়েছে, সাধনমালা থেকে বিনয়তষ ভট্টাচার্য তারার চব্বিশ নাম পেয়েছেন। তিব্বতে তারার ১০৮ রূপ আছে জানা যায়। তিব্বতের তাংখা চিত্রে একুশ তারা দেবীর চিত্র অনেক সময় দেখা যায়। সুপ্রাচীণ কাল থেকে তারা দেবীর পূজা ভারত থেকে চীন পর্যন্ত বিস্তৃত। একেক জায়গায় একেক ধর্মে একেক রূপে তারাকে পূজা করা হয়েছে। মহাযান বৌদ্ধধর্মে স্থানীয় বিশ্বাস এবং সংস্কৃতির সাথে সমন্বয় করার প্রবনতার প্রধান স্বাক্ষী বলা যায় তারা দেবীর বৈচিত্রময় উপস্থিতিতে। ধর্মপ্রধান বা পুরোহিতের খুব বেশি নিয়ম কানুনের বেড়াজালে তারা আবদ্ধ থাকেননি। হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈনসহ বিভিন্ন ধর্মে সে জায়গা করে নিয়েছে। প্রথমে নারী শক্তি হিসেবে পুরুষের পাশে অবস্থান করে পরবর্তীতে একক ভাবে সমস্ত বিশ্ব

জগতের ত্রাতা, সমস্ত জ্ঞানের আধার এবং বিশ্বজগতের জননী হিসেবে অধীষ্ঠান করেছেন। নির্দিষ্ট কোন স্থান, কাল, নারী, পুরুষ, বর্ণ, গোত্রে আবদ্ধ না থেকে তারা সকলের কাছে সার্বজনীন রূপ পেয়েছে।

তথ্যসুত্র :

১. Shastri, Hirananda, *The origin and cult of tara,* Published by the director general archaeological survey of India Janapath, New Delhi, 1998

২. Bhattasali, Nalinikanta, *Iconography of Buddhist and Brahmanical sculptures in the Dacca Museum*, Bangladesh National Museum, 1929

৩. *Sculptures in Bangladesh,* Editors Enamul Haque and Adalbert J. Gail, ICSBA, 2008.

৪. Haque, Enamul, *Bengal Sculptures,* Bangladesh National Museum, 1992.

৫. Majumder, R.C. *The History of Bengal, Vol-1,* (Delhi 2003), reprint.

৬. Rahman, *Mukhlesur, Sculpture in the varendra research museum-A descriptive catalogue,* Varendra researce museum, University of Rajshahi, 1998.

৭. Dhavalikar, M.K., *The origin of Tara,* Bulletin of the Deccan College Post-Graduate and Research Institute, Vol. 24(1963-1964), pp.15-20

৮. Shaw, Miranda, *Buddhist Goddesses of India*, Princeton University Press, Oxford, 2006

৯. Alam, A.K.M. Shamsul, *Sculptural art of Bangladesh; Pre-Muslim Period*, Department of archaeology and Museums, Dhaka, 1985

১০. Banerji, S.C. *Tantra in Bengal*, Manohar Publication, Delhi, 1978

১১. Shastri, Manmatha Nath, *The history of Buddhism,* Aryan books International, New Delhi, 1996

১২. শাস্ত্রী, হরপ্রসাদ, *বৌদ্ধধর্ম,* নবযুগ প্রকাশনী, ঢাকা, ২০১১

১৩. সাংকৃত্যায়ন, রাহুল, *বৌদ্ধ দর্শন,* প্রকাশনায় মাটিগন্ধা, ঢাকা, ২০২১

১৪. সম্পাদনাঃ রাইন, রায়হান, *বাংলার ধর্ম ও দর্শন,* সংবেদ প্রকাশনী, ঢাকা, ২০০৯

১৫. রায়, নীহাররঞ্জন, *বাঙ্গালীর ইতিহাস, আদি পর্ব,* দ্রেজ পাবলিশিং, কলতাতা, ১৩৫৬

[**Abstract**: The name of Tara as a goddess is not heard much now, but in the past Tara Devi was very popular in South Asia i.e. Indian subcontinent. Tara Devi has a presence in both Buddhism and Hinduism. Jainism also has a presence of Tara Devi, but her importance is minor there. In Mahayana Buddhism, the goddess Tara is usually depicted as a Buddha and Bodhisattva. In Shaktism of Hinduism Tara is present as female energy. Many sculptures of Tara Devi are found in undivided India and Bengal. From this it can be assumed that Tara Devi was very popular in this region at that time. Tara Devi is mainly worshiped as a harbinger of danger. Especially if someone is in danger in the water, rescue him. She is said to give direction and control floods while in water. The Sanskrit word Tara means "to swim across". In Tibet, China, Japan, Korea, they carry the same name everywhere. It is not known

exactly when Tara Devi originated in Buddhism, but the oldest sculptural examples of her are known to have been found in the Ellora Caves. Her sculptures are believed to have been produced from the sixth century onwards. Many Tara sculptures in that sense are found in different places till Muslim rule in the Indian subcontinent. At present Tara Devi is worshiped among Buddhists in Tibet, China, Japan, Nepal, Bhutan, Mongolia.]